বর্ত্তমান সমাজ ও শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী

গোবিন্দ দেব মজুমদার

সালটার কথা ঠিক মনে নেই। খুব সম্ভব ১৯৫২ সাল। ঘুরে বেরানো আমার একটা নেশা। ঘুরতে ঘুরতে এসে গেলাম দেওঘরে। অবাক অবাক চোখে দেখলাম এদিকে ওদিকে গেরুয়া রঙের মাটির ঢেউ।সাঁওতাল পরগনার ঊসরপ্রান্তর কোথাও ঢালু হয়ে নেমে গেছে আবার কোথাও উঁচু হয়ে উঠে গেছে অনেক উপরে।শহরে ঢুকতেই বালিতে ভরা নদী দারোয়া। জসিডি হতে দেওঘর আসার ট্রেন লাইন নদীর ওপর দিয়ে বিছিয়ে দেয়া।শহরে এদিকে ওদিকে পিচ আর মোরামের রাস্তা।দুপাশে মহুয়া, ইউকেলিপ্টাস আর কৃষ্ণচুড়া গাছের সারি।হালকা ঝিলমিলে রোদ, ফুরফুরে হাওয়া। তাই মধুপুর, দেওঘর বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রিয় জায়গা।এমনি একটা মোরাম বিছানো রাস্তা দিয়ে পৌঁছে গেলাম বড়ালবাংলোতে। রাস্তাটার নাম রোহিণী রোড।বড়ালবাংলোর একটা অংশ যতি-আশ্রম।সব জাযগা জুড়ে অসংখ্য লোকের ভীড়।রিক্সা,টাঙ্গা,ট্যাক্সি বাস আর কারের অনবরত আনাগোনা।যতি আশ্রমের বারান্দায় বসে আছেন এক নধর দেহী মধ্য বয়সী পুরুষ।পরনে চুল পেড়ে ধুতি।খালি গা, বুকের ওপর লুটিয়ে রয়েছে একগাছি শুভ্র উপবীত।সারা দেহ হতে যেন একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।বলে দিত হল না। বুঝে গেলাম ,ইনিই সেই বহুবিতর্কিত পুরুষ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র।বিছানায় এদিকে ওদিকে রাখা আছে কয়েকটা সাদা ধবধবে তাকিয়া। ঐ তাকিয়ায় একটায় ঠেস দিয়ে উনি বসে কিছু বলে যাচ্ছেন।কখনো বাংলায় আবার কখনো ইংরেজীতে।একজন ভদ্রলোক চটপট ওঁর কথাগুলি নোট করে যাচ্ছেন।যিনি ওঁর কথাগুলি নোট করছিলেন, শুনলাম ওঁরই নাম

প্রফুল্লদা।প্রফুল্লদার পরনেও সরু চুল পেড়ে ধুতি,গায়ে সাদা ফতুয়া। চলাফেরায় বেশ ক্ষিপ্রতার ভাব।

নিয়ম অনুযায়ী যতি আশ্রমের ঘেরা জায়গার এপাশ হতেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুরকে প্রণাম করলাম।

দেওঘরে সৎসঙ্গ আশ্রমে যাওয়ার একটা কারন অবশ্যই ছিলো।শুনেছি ধর্ম্ম নাকি তাই যা মানুষ পাপ হতে পতন হতে ওপরে তুলে রাখে।সব ধর্ম্মের মূল কথাই এক।কোন ধর্ম্মই বলে না, অমানুষ হয়ে যাও, চুরী করো ,মিথ্যে কথা বলো।মানুষকে কষ্ট দাও।পৃথিবীর সব ধর্ম্মই তো সততার কথা বলে থাকে।তাহলে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? আর এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে , সংস্কৃতির চাকচিক্যের মাঝে অত ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করে মাথা খাটানোর বা প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, আরো অসংখ্য মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী তো শুধু মাত্র ভারতে নয় , সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।মঠ,আশ্রম, মন্দির প্রায়,প্রায় সর্ব্বত্রই মাথা উঁচু করে ঘোষণা করছে ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা আর তাৎপর্য্যকে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাণী উপদেশ নিয়ে এত মেতে ওঠার কী আছে ? অনেক ক্ষেত্রে তো বরং কটু সমালোচনাই শুনেছি। তাই প্রবল আগ্রহ নিয়ে সৎসঙ্গের কিছু গ্রন্হ পড়ে ফেললাম। যোগযোগ করলাম কয়েকজনা বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ঋত্বিকাচার্য্য (কেষ্টদা) ,প্রফুল্লদা,ননীদা,যতীনদা, শরৎদা, কালিদাসদা,পেলেদা প্রভৃতির সঙ্গে। তাঁদের অনেকেই আগে ছিলেন বিরাট অফিসার, ইন্জিনিয়ার,চিকীৎসক,সাহিত্যিক, অধ্যাপক, আইনজিবী বা অন্য কোন বিশিষ্ট জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন এরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সেবক ,তাঁর অমর বাণীর বাহক।প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে কিছু না কিছু আলোচনা করি।আর সকালে সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নি:সৃত বাণী প্রাণ ভরে শুনি।তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর শ্রীমুখ হতে ঝরে পড়া

অমৃত বাণী শোনার সৌভাগ্যের জন্যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

পাশ্চাত্যের শিক্ষা আর সংস্কৃতি বর্ত্তমান সমাজে আরাধনার বস্তু।কিন্তু সে শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের চেহারা একটু আলাদা।বিশ পঁচিশতলা মাল্টিষ্টোরিড বিল্ডিংএর ওপর সাজানো গোছানো একটি এয়ার কন্ডিশন্ড ফ্ল্যাট। ভোগ বিলাস আর আরাম আয়েসের কত রকম জিনিস সেই ফ্ল্যাটগুলো বোঝাই করা । পার্লার, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস, কিচেন,বাথরুম মনে হবে বিদেশ হতে আনা দুর্মূল্য সব উপকরনে ভরে দেওয়া হয়েছে এগুলি। হাত বাড়ালেই ফোন, পা বড়ালেই লিফ্‌ট । মাটি ছুঁলেই নতুন মডেলের গাড়ি।গাড়িতে উর্দি পরা ড্রাইভার। তার পাশে তকমা আঁটা চাপরাশি।শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসের সুদৃশ্য চেম্বার । মাইনেও চার ফিগার পেরিয়ে গেছে। ঘরে মোমের পুতুলের মত সুন্দরী স্ত্রী। বিজাতীয় কায়দায় চুল ছাঁটা। তেমনি সাজ পোষাক ।শাড়ি, ব্লাউজ প্রকৃতই বটে।কিন্তু দেখলে মনে হবে একটুক্ষণ আগে কোনও ফিল্ম ষ্টুডিও হতে কোন মেকআপম্যান (উওম্যান) এসে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। বিয়েব পনেরো বছর আগে হয়ে যাওয়ার পরেও দেখলে মনে হচ্ছে যে এইমাত্র বিয়ে হয়ছে। পনেরো বছর পরে হযেছে একটি ছেলে কিংবা একটি মেয়ে। চেহারাও তেমনি। ঠিক যেন শোকেসের ডল নেমে এমেছে।ঘরে চলা ফেরার সময় লাফিয়ে এসে হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরছে লোম ঝুমঝুমে কুকুর। স্বামী অফিসে বেরিয়ে যেতে না যেতেই আয়ার কাছে ছেলে গছিয়ে স্ত্রীও চললেন নিজের অফিসে।সে গাড়িখানাও ওর স্বামীর গ্যারেজের পাশেই থাকে।ড্রাইভার না এলে ভদ্রমহিলাটি নিজেই ড্রাইভ করে মহানগরীর হাজার হাজার গাড়ির ভীড়ে নিজের গাড়িখানাকেও মিলিয়ে দেন।টেলিফোন বা ইন্টারকামে দেববাণীর মত ওঁর গলার স্বর শোনা যায়।ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে নাকি ভদ্রমহিলার গ্রচন্ড দখল।

কিন্তু ওঁদের মত অনেকের ঘরেই শুনেছি বাবা মায়ের জায়গা হয় না।(এটা কিন্তু সকলের কেস নয়)। দাদা বৌদি বা আত্মীয় স্বজন এ বাড়িতে আসতে ভয় পান। ছোট ভাইকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছেন।বিয়ের পর বোনেরা এ মুখো হয় না ।অবিবাহিতা বোনটা তো গরীব।বড় ভাই এর আশ্রয়ে এখনো পড়া শোনা করছে ।মাঝে-সাঝে বন্ধু বান্ধবীরা এসে হৈ হুল্লোড় করে।তাও গোনা গাঁথা।ওঁদের সমপর্যায়ের না হলে প্রেস্টিজ যাবে না।

কিছুদিন পরেই শুনেছি ঐ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার ডিভোর্স হয়ে গেছে।ভদ্রমহিলাটি এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে অন্য ফ্ল্যাটে গিয়ে বাস করছেন।ওঁর প্রাক্তন স্বামীও থাকেন এক পার্শি মহিলাকে নিয়ে।ছেলেটি পাপ্পার কাছেই থাকে।অবশ্য কনভেন্ট হোষ্টেলে।ভদ্রলোকটি নাকি ভয়ংকর ড্রিংক করেন।একদিন শোনা গেল প্রচন্ড ড্রিংক করে গাড়ি চালাতে গিয়ে উনি মারাত্মক ভাবে এক্সিডেন্ট করেছেন।বহুদিন বড় নামী হাসপাতালে থেকে চিকীৎসা হওয়ার পর উনি ছাড়া পেলেন।কিন্তু পা দু খানি নেই।উনি সারা জীবনের মত পঙ্গু আর অকর্মণ্য হয়ে গেলেন।পার্শি স্ত্রীও ওঁকে ছেড়ে বোম্বে চলে গেছেন।

সেদিন খবরের কাগজে দেখা গেল ওঁর প্রথমা স্ত্রী কি একটা ব্যাপারে ঝামেলা হওয়ায় সেই মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে আত্মহত্যা করেছেন।আত্মহত্যার স্টাইলটাও বেশ আলাদা। তিরিশ তলার ওপর হতে রাজপথে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন।এই জাতীয় ব্যাপারই হচ্ছে।

অধিকাংশেরই চরিত্র নেই।সততা, পাপ পুণ্যের বিচার বোধ, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখানোর অনুভুতি লোপ পেয়েছে।স্বামী স্ত্রীকে ,স্ত্রী স্বামীকে অবিশ্বাস করছে।ছাড়াছাড়ি ডিভোর্স।আবার অন্যের সঙ্গে ঘর বাঁধা । শেষে খুন বা আত্মহত্যা।ডাকাতি,লুঠ,খাদ্যে আর ওষুধে ভেজাল , নারী ধর্ষণ,কিডন্যাপ, হত্যা এ সব রুটিন ব্যাপার।ভয় নেই,লজ্জা নেই,স্নেহ

মমতা ভালবাসা নেই।শুধু লোভ লালসা ,মদ মাৎসর্য্য আর অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ । বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে স্ফুর্ত্তি করা ,কিংবা বান্ধবীকে মিথ্যা বলে তার স্বামীকে নিয়ে মৌজ করা । নাচ,গান,ড্রিংক,ডিনার,নাইট ক্লাবে অন্যের ঘরের নারী বা পুরুষকে নিয়ে রাত কাটানো মস্ত বড় এরিষ্টোক্র্যাসী । ব্যাপারগুলো ঠিক যেন সেই প্রিমিটিভ যুগের । কাঁচা মাংস ঝলসে খাওয়া, সঙ্গে সুরা পানে বিবস্ত্রা মানবী।আদিম উল্লাসে চীৎকার আর হৈ হুল্লোড়।তার সঙ্গে সায় দেবে বিদেশী যন্ত্র সঙ্গীত।মনের মাঝে গভীর অরণ্যের অন্ধকার ছায়া।বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিদ্যে মগজে ঢুকিয়ে স্যুট,বুট পরে ,টাই বেঁধে লিফ্‌টে করে স্কাইস্ক্রেপার ওঠা নামা করলে কী হবে, মানুষ আর পশুর ডেফিনেশনটাই ঠিক কী জানা নেই তো।মানুষের প্রতি ভালবাসা,কর্ত্তব্যেবোধ ,ক্ষমা,উদারতা,ঈশ্বরে ভক্তি,বিশ্বাস উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ ,এসব তো ব্যাকডেটেড ব্যাপার। এদের আছে শুধু অর্থ উপার্জ্জনের নেশা আর ভোগ বিলাসের আকন্ঠ পিপাসা।

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরনে আমাদের জাতীয় জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।ওখানে যখন দিন , এখানে তখন রাত্রি।ওখানে যখন গরম জামা পড়া হয় , এখানে তখন গায়ে সুতীর জামা কাপড়ে গলগল করে ঘাম হয়।ওখানে মদ মাংস না খেলে মানুষ ঠান্ডায় জমে যাবে,এখানে দই ঘোল খেয়েও মানুষ পেটের অসুখে ভুগে মরে। জলহাওয়া,সামাজিক জীবন ,আচার আচরণ সবই ভিন্ন ভিন্ন। তাই উনি বলেছেন যখন যেখানে যে ভাবে চলতে হয় , সেই ভাবেই চলা উচিৎ।কিন্তু এখন মানুষে চলাটাকে ভূলে গেছে। চলতে হয় চলছে, কি ভাবে চলতে হবে জানে না।দুপুর রোদে আগুনের মত তপ্ত শুধু মাত্র খোয়াঢাকা রাস্তায় যদি খালি পায়ে ছোটা যায় তো পা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবেই।ফোস্কা পড়াই শুধু নয়, পায়ের তলার চামড়া ছুলে বেরিয়ে যাবে।উনি আবার বলেন, প্রাচ্যের সংযম,দর্শন আর

সাধনার সঙ্গে মেলাতে হবে পাশ্চাত্যের সাহস,বল,অধ্যবসায়,বিজ্ঞান আর সব কিছুকে মুকাবিলা করার মনোবৃত্তি কে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন বর্তমান সমাজে ও দেশে মানুষের জীবনে প্রতি স্তরে ঢুকে গেছে ভয়ংকর ব্যাধি । এত জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত জীবনকে ঢেলে সাজাতে গেলে কঠিন চিকীৎসার দরকার।সেটা এক রকম প্রায়শ্চিত্তই বলা যায়।এই ক্ষয়ে যাওয়া মানবিকতা,বিধ্বস্ত চরিত্র আর হারিয়ে যাওয়া মানসিক শক্তিলাভের জন্যে প্রয়োজন কঠোর সাধনার।সেই সাধনা পুষ্পান্জলি,মন্ত্রপাঠ বা পশুবলিতে সার্থক হবে না।

সর্ব্বপ্রথম গ্রহন করতে হবে জীবন্ত আদর্শকে । তাঁর চলা-বলা, আচার-আচরণ, অভ্যাস আর অধ্যবসায় প্রতিদিন কঠোর সংযম আর সাধনার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে। পারিপার্শ্বিকের মনে প্রাণে জীবনে তাঁর জ্বলন্ত আদর্শ আর অনুভবকে জাগিয়ে তুলতে হবে।মনে রাখতে হবে সত্যম,শিবম এবং সুন্দরমের প্রতিষ্ঠায় শ্রী চৈতন্যদেবকে জগাই মাধাইয়ের হাতে হতে হয়েছিল নিগৃহীত আর ভগবান যিশুখৃষ্ট হয়ছিলেন ক্রুশবিদ্ধ। তাই সমাজে নিজ আদর্শ আর ইষ্টের প্রতিষ্ঠা অত সহজ ব্যাপার নয়।সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া মানুষের হৃদয়ে আর মস্তিষ্কে তাঁর আসন পেতে দেয়া,ভয়ংকর কঠিন কাজ।একাজে এগুতে গেলে নিজে হতে হবে প্রচন্ড শক্তিশালি।হাজার প্রশ্নকে কাটতে হবে, উত্তর দিতে হবে , সব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, তার গুঢ় রহস্য ভেদ, যুক্তি তর্ক,মীমাংসা,ধর্ম্ম,দর্শন , জীবন আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আর উপলব্ধি আয়ত্ব করতে হবে।প্রচার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।নিজে যদি অসৎ হই , তাহলে অন্যকে সৎ হওয়ার উপদেশ দিতে পারি না, নিজে যদি ভোগী হই , সেক্ষেত্রে অপরকে ভোগ ত্যাগ করার উপদেশ দিতে পারি না । নিজে যদি দু:শ্চরিত্র হই, অন্যকে চরিত্রবান হওয়ার কথা বলা চলে না। তাই সর্ব্বপ্রথম আত্মশুদ্ধি এবং প্রস্তুতি।তারপর নিজের আদর্শ এবং ইষ্টের প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়ে

লেগে যাওয়া।একেই বলা হয় 'যজন যাজন ' । শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন 'যজন যাজন ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি'।

শ্রীশ্রী ঠাকুর তাই ভোগে, বিলাসে মগ্ন অচেতন মানুষকে আহ্বান করে বসলেন , আর নয়,এবার ওঠো,জাগো। ভোগে অসংযমে মৃত্যু।তাই অমৃতের পথ ধরো ।ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম হতে ওঠো । প্রাত:কৃত্য শেষ করে স্নান করো।তারপর শুদ্ধ পবিত্র মনে প্রচণ্ড একাগ্রতার সঙ্গে জীবন্ত আদর্শের নাম এবং ধ্যানে লীন হয়ে যাও। সেইসময় গুরুদেবের উদ্দেশে একমুঠো চাল বা দশ বিশ পয়সা নিবেদন করো।এতে মনে তৃপ্তি আর শান্তি আসবে।মনে হবে , আমার সৎ উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ বা অন্নকে আমার ইষ্টকে নিবেদন করে,প্রাত্যহিক জীবন শুরু করছি।বুকের মাঝে জ্বলে উঠুক সৎ জ্ঞান, মানুষকে ভালবাসার আর সেবা করার প্রবল আকাঙ্খা।আমার সারা দিনের সাধনা যেন. হবে তাঁর বানী,তাঁর আদর্শকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার।তাঁরই রঙে যেন আমার জীবন রঙ্গীন হয়ে ওঠে।তাঁকে ধ্যান , তাঁর চিন্তা ,তাঁর চলার পথে চলা,তাঁরই শোনানো কথা বলা। এই পবিত্র ব্রততে যদি শুদ্ধ মনে লীন হয়ে যাওয়া যায়,তাহলে মৃত্যু বা কোনপ্রকারের অমঙ্গল মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না। এই যজন,যাজন,ইষ্টভৃতি ব্রততে শ্রীশ্রী ঠাকুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভাষায় এসব হলো 'চলন ছাড়া(হারা) চরণ পূজা ' কামনা বাসনায় অন্দ্ধ মন নিয়ে যদি যাগ যজ্ঞ করা হয়,পশুবলি দেয়া হয় কিংবা একশো আট পদ্মের অঞ্জলি দেয়া হয় তাতে পুণ্যলাভ বা মনস্কামনা সিদ্ধি হয় না। লেখাপড়া না করে, মায়ের পাযে শুধু ফুল বেল পাতার অঞ্জলি দিয়ে পাশ করার ইচ্ছের মত, এও একটা হাস্যকর প্রয়াস।সুখ,শান্তি,সমৃদ্ধি আর আনন্দ প্রাপ্তির জন্যে যে সব পথ শ্রীশ্রী ঠাকুর চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সেই পথে নির্ধারিত নিয়মে পবিত্র সুন্দর মন নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে । হঠকারিতা নয়,উত্তেজনা নয়। ধীর পদক্ষেপে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ইষ্টের আশীর্ব্বাদ ধন্য

পথে এগিয়ে চলা।এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্হা। এর ভেতর কোন রকম বুজরুকি,অস্পষ্ট বা ধোঁয়া ব্যাপার নেই।তাঁর নির্দেশিত চলার পথে কোন গুপ্ত শাস্ত্রের ইঙ্গিত বা রহস্যময় মন্ত্রতন্ত্র নেই। দিন,ক্ষণ,তিথি,লগ্ন,যাগ,যজ্ঞ,হোম,আহুতি বলিদান এসব কিছুই উহ্য। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন প্রতিদিন পবিত্র মনে সৎনাম জপ করো,বুকের মাঝে প্রাণের মাঝে ভগবৎ প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে নাও।সেই আগুনে সব পাপ তাপ কামনা বাসনার পশুগুলিকে জীবন্ত আহুতি দাও।এই যজ্ঞ শেষ হলে স্হির প্রতিজ্ঞায় ,অটল পদক্ষেপে অনন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হও।কোনও অনাত্মীয় পুরুষ তোমার বন্ধু,তোমার ভাই।তারই যুবতী স্ত্রী ,তোমার মা,তোমার জননী। সাহসকরে এগিয়ে গিয়ে তাকে মা বলে ডাকো। প্রতিটি নারীর মাঝে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া, কালী করালবদনীকে আবিস্কার করো।এই তোমার শক্তি পূজা।অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পশুবলি দিয়ে রক্তগায়ে মেখে মা মা করে না চেঁচালেও চলবে।অন্ধকার ব্যাপারগুলো ভূলে আলোতে এসো।সব কিছু শুদ্ধ ,স্বচ্ছ,পরিস্কার ব্যাপার।শ্রীশ্রী ঠাকুরের উপদেশ হলো,সর্ব্বপ্রথমে স্বয়ং সম্পুর্ণ মানুষ হও। তাবপর সুশিক্ষা ,সংস্কৃতি আর কঠোর সৎ পরিশ্রমে উপার্জ্জন নিজে মানুষ হও, অন্যকেও মানুষ হতে সাহায্য করো। প্রতিটি মানুষ যেন তোমার চলা,বলা,আচার,আচরন,ভগবৎ প্রেম,ক্ষমা,সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধ পুলকিত হয়ে তোমার মত হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগে।তুমি সকলের কাছে হয়ে উঠবে বরণীয়।নিজেকে বড়,মহৎ আর জ্ঞানী বলে জাহির করবে না, তোমার আচরনই বলে দেবে তুমি কি আর কতটা।উনি বলেছেন ‘মানুষ আপন টাকাপর,যত পারিস মানুষ ধর। ‘অর্থাৎ মানুষকে আপন করে নাও।সেবা,শুশ্রূষা,ভালবাসা,সহানুভূতি দ্বারা সকলেই তোমার পারিপার্শ্বিক হয়ে উঠুক তোমারই দেহ বা হৃদয়ের একটা অংশ।সকলেই তোমার কাছ হতে বাঁচা,বাড়া আর অগ্রগতির ফর্মুলা জেনে নিক। মন্ত্রকে মন্ত্র না বলে ফর্মুলা বললেই ব্যাপারটা সাফ হবে।উনি বলেছেন ‘কিছু

চাইবে না,শুধু দিয়ে যাবে,দেখবে সব তোমার হয়ে যাচ্ছে।' উনি অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে আদেশ দিয়েছেন। উনি বলেছেন পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে নিজে বড় বা সুখী হওয়া যায় না। তাই পারিপার্শ্বিকে.র ইষ্টস্বার্থে নিজের মনের মত করে গড়ে নিতে হবে।পারিপার্শ্বিক যদি সুস্থ,সৎ, উন্নতিশীল ,পরিশ্রমী আর ইষ্টপ্রাণ হয় তো নিজের সাধনার পথ হবে সুগম। সাধু সংসর্গে লোক সাধুই হয়, আর মাতালের পাশে থেকে লোক মাতালই হয়ে যায়।

যারা সমাজে শোষণ করে বড় হয়ে আনন্দ পান,তাঁদের উদ্দেশে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বক্তব্য হলো -'মানুষকে শুষে খেলে যদি এত লাভ তো তাকে বাড়িয়ে খেলে লাভ কত বেশী !' অর্থাৎ মানুষকে মনে করতে হবে বেগুনের ক্ষেত।মূলোর ক্ষেত নয়।মূলো তুলতে তুলতে ক্ষেত শেষ। কিন্তু বেগুনের ক্ষেত অত জলদি শেষ হবার নয়।আজ তুললে কাল আবার হবে। তাই মানুষকে বাঁচাও ,বড় করে তোলো তার উপার্জ্জনের ক্ষমতাকে বাড়াও , তারপর তার কাছ হতে কিছু আশা করো।

উনি আমিষ খাদ্য আর মাদক দ্রব্যকে বর্জন করার নির্দ্দশ দিয়েছেন। **'মাছ মাংস খাসনে আর, পেঁয়াজ,রসূন মাদক ছাড়।'**

ওঁর মতে পরিপক্ক ফল,সুপুষ্ট তরকারী বা সব্জী,আনাজ আর গরুর খাঁটি দুধে হবে জীবনী শক্তি পূর্ণ মাত্রায়। জল,হাওয়া,মাটি আর সূর্যের অবারিত কিরণ হতে ঐ ফল,সব্জী,আনাজ অফুরন্ত প্রাণশক্তি আহরণ করে। এতে থাকে অমৃতের অংশ।অর্থাৎ এতে অটো এক্সক্রিশন সঞ্চিত হয়ে অমৃতধ্বনিতে পরিনত হয়। তাই এই সব খাদ্য খেলে দেহে প্রবেশ করবে অমৃতের অংশ। এ হতে মানুষ দেহে প্রাণে পাবে অফুরন্ত জীবনধারা।

কোন প্রাণীকে হত্যা করায় তার দেহের কোষে কোষে সাক্ষাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা জমাট বেঁধে যাবে। সেই মৃতদেহকে খেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেই খাওয়া হবে ।এই খাদ্য খেলে সাময়িক ভাবে বডি সেল খানিকটা উত্তেজিত হয় পড়ে, কিন্তু অল্প সময়েই সে উত্তেজনা নিভে যায়। কিন্তু এক গ্লাস মদ

খেলে মানুষ যেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই সে উত্তেজনা মানুষের মস্তিষ্কে আর স্নায়ু মণ্ডলীকে নির্জীব আর অবসাদগ্রস্ত করে দেয়।কিন্তু এক গ্লাস খাঁটি দুধ এনে দেবে,শরীর আর মস্তিষ্কে পুষ্টি আর শক্তি। শাস্ত্রে আছে , আহার শুদ্ধি হলেই চিত্ত শুদ্ধি হয়। আর চিত্ত শুদ্ধতা এলেই সেখানে ভগবানকে বসানো যায়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর বিবাহের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে নারী বা পুরুষের অবিবাহিত জীবন যাপন করা বা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকাকে অস্বাভাবিক জীবন বলে বিবেচিত। তাতে যাঁদের শারিরীক কোন অক্ষমতা বা বিকৃতি আছে,তাঁদের বিবাহ করা অনুচিত। কিন্তু সুস্হ ,সবল নিরোগ স্ত্রী পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পোক্ত এবং সবল জাতি গঠনের জন্যে নিতান্ত আবশ্যক।মানুষ সামাজিক প্রাণী । যাতে সুস্হ সমাজ বৃদ্ধি পায় এবং সুসংহত এবং সুগঠিত হযে ওঠে তার জন্যে থাকতে হবে সদা সচেষ্ট। অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য অথবা সন্নাস গ্রহণ করে সমাজ সংসার হতে দূরে সরে ভগবৎ সাধনায় লীন হয়ে গেলে, সমাজ বঞ্চিত হবে। সমাজকে বঞ্চিত করার অধিকার কোন মানুষের থাকা উচিৎ নয়।আত্মহত্যা করা যেমন অপরাধ , তেমনি সমাজকে বঞ্চিত করে আত্মনিগ্রহ বা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করা ও এক রকমের অন্যায়।বর্ত্তমান সমাজে দেখা যায়, পুরুষ ভোগ বিলাসে উচ্ছৃঙ্খল, নারী ও কামনা বাসনায় অন্ধ।অর্থ আর ভোগের বিভিন্ন উপকরণের চাহিদায়, নারী দিশেহারা। সেই নারী পুরুষের মিলনে সমাজ হয়ে উঠতে পারে পাপের আগার। তাই তো উনি বর্ণনা দিয়েছেন,

‘পুরুষ মাগে নারীর প্রণয় ,
নারী মাগে টাকা
এমনি করেই চলছে জগৎ ,
বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা।‘

শ্রীশ্রী ঠাকুরের চোখে বিবাহে নারীর ভূমিকাই বড়। পুরুষ বংশ মর্য্যদায় ,শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উপার্জ্জনে স্বাস্থ্য শক্তিতে , বয়সে বড় অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ।ইষ্ট প্রাণ সেবা পটু সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নারী তাকে করবে আত্মনিবেদন। এ অনেকটা আগেকার দিনের সেই স্বয়ংবর সভার নারীর বরমাল্য পরানোর মত ব্যাপার।কিন্তু নারী যেন সেই পুরুষের তুলনায় হয় সর্ব্বপ্রকারে ইনফিরিয়র।বংশে,শিক্ষায়,আর্থিক অবস্থায়,সৌন্দর্য্যে।এই বিবাহকেই বলা হয় অনুলোম বিবাহ। এই বিবাহই হবে সুখের এবং চিরস্থায়ী। আর এর বিপরীত হলেই তাকে বলা হবে প্রতিলোম বিবাহ। অর্থাৎ পুরুষ ইনিফিরিয়ার,স্ত্রী সুপিরিয়ার ।সেই বিবাহ দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করবেই।তাদের অসুখী জীবনে যে সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করবে তারাও হয়ে উঠবে উচ্ছৃঙ্খল দুর্নীতিপরায়ন,দেহ আর মনের দিক দিয়ে ও অসম্পূর্ণ।এতে সমাজ হয়ে যাবে দুর্ব্বল আর পঙ্গু। এর দ্বারা সমাজের অগ্রগতি ব্যহত হবে । বিশেষ পরিস্থিতিতে ইষ্ট প্রেমে বিভোর কোন শ্রেষ্ঠ উপযুক্ত পুরুষকে একাধিক নারী ও আত্মনিবেদন করে বিবাহ করতে পারে।তবে সেই নারীদের মধ্যে যেন কোনও রকম বিরোধের ভাব না জাগে।ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই বটে।কিন্তু এর ব্যাখ্যা আলাদা। পুরুষ কখনও কোন দ্বিতীয়া নারীর প্রতি আকৃষ্ট হবেন না।দ্বিতীয়া নারীই প্রথমা স্ত্রীর সমর্থন এবং অনুমতি নিয়ে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বরণ করার জন্যে এগিয়ে আসবেন।এই বিবাহে স্ত্রীদের ভেতর কোনও বিদ্বেষের ভাবনা থাকতে পারে না।এক গুরুকে কেন্দ্র করে গুরুভাইদের মধ্যে যেমন একটা প্রীতির ভাব গড়ে ওঠে,প্রিয় কবি এবং লেখককে ঘিরে যেমন সৃষ্টি হয়,অনুরাগী পাঠকের চক্র , তেমনি ইষ্টপ্রাণ কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের সেবায় এবং পরিচর্য্যায় নিবেদিত দুটি নারীর মাঝেও সেই একই ধরনের সেতুবন্ধ রচনা করা হয় । যেখানে স্বার্থে আঘাত পড়ে, সেখানেই সৃষ্টি হয় কলহ বা মনোমালিন্যের।কিন্তু নি:স্বার্থ প্রেম বা আত্মনিবেদনের মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধের প্রশ্ন নয়।বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে এমনও হতে পারে।

সৎসঙ্গে স্ত্রী জাতিকে মাতৃস্থানে সম্মান করা হয়। সমবয়স্ক বন্ধুকে বলা হয় দাদা। কিন্তু তারই স্ত্রী কিন্তু মিসেস অমুক,বউদি,মেমসায়েব,ম্যাডাম,দিদি বা দিদিমণি নন। তিনি সাক্ষাৎ মা! তাকে মা বলে সম্বোধন করতে হবে। প্রথম প্রথম এতে খুবই অসুবিধা হয়।বলতে কেমন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে গেলে মনে পাওয়া যায় অপার আনন্দ।কোনও সমবয়স্কা যুবতী নারী কে মাতৃ সম্বোধনে নিজেকে বেশ একটা সাধু সাধু বলে মনে হয়।মনে এই সাধুতাকে জীইয়ে রাখার জন্যে একটা সংযত শক্তি যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।মনে হয় সত্যিই বুঝি আমি সাধু টাধু হয়ে গেছি।কখনো কোন খারাপ চিন্তা মনে আসতে পারে না। গেরুয়া বস্ত্র পরে যেমন চুরী করতে লজ্জা করে,তেমনি কোনও নারীকে মা বলে ডাকার পর অন্য কোনও নারীর সম্বন্ধে খারাপ চিন্তা মনে আসলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হবে। সৎসঙ্গে দেখেছি মেয়ের বিয়ে কোন সমস্যাই নয়। পণ বা যৌতুকের জন্যে কোন চাহিদা নেই। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়ে পছন্দ করার পরে পাত্র পাত্রীর মত হলেই বিবাহ স্হির করা হয়।তবে বিয়ের সব কিছু নির্ভর করছে আগের আলোচিত বিষয়গুলি অনুসারে। মালা বদল,মিষ্টিমুখ আর সামান্য অনুষ্ঠানেই বিবাহ উৎসব সমাপ্ত।

কোনো বিশেষ কারনে যদি কারো বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন হয় তো সে অর্থ সংগ্রহ কোনও কঠিন ব্যাপার নয়।বড় রকমের অপারেশন কিংবা প্রাণরক্ষার জন্যে বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজনে বেশী খরচের অঙ্কও খুব জলদিই সংগ্রহ হয়ে যায় ।লক্ষ লক্ষ গুরুভাই এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলে ব্যাপারটা কিছুই কঠিন নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনও না কোনও প্রধান ব্যক্তি বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে দাঁড়ালেন।বললেন ‘দাদা ভিক্ষা দিন!‘

‘কী ব্যাপার ?‘

‘অমুকের প্রাণ রক্ষার জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার!‘

ঠিক এমনি একটা কেসে অন্য প্রদেশের এক মন্ত্রী মহোদয়কে ও দরজায় কড়া নেড়ে এসে দাঁড়াতে দেখেছি।

অন্যের জন্যে ভিক্ষা করার প্রবৃত্তি মনের সব গর্ব্ব,অহংকার আর আভিজাত্যবোধ নির্মূল করে দেয়।এ যেন সেই প্রাচীন যুগের রাজকুমাদের গুরুগৃহে থেকে ভিক্ষায় বেরোনোর মত ব্যাপার।

শ্রীশ্রী ঠাকুররের নির্দেশ হলো সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের মতবাদ আদর্শ আর উপদেশেকে গ্রহণ করো। তারপর সেই চলার পথে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশেষ মহাপুরুষের জীবন এবং আচরণকে অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া।তাই অন্য কোনও ধর্ম্ম ,নীতি বা ইডিওলজির সঙ্গে সৎসঙ্গের কোনও বিরোধ নেই। পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার করেই পরবর্ত্তীর আগমন।

তিনিই বলেছেন মহামানব হজরৎ মহম্মদের কাছ হতে শোনো শান্তির বানী আর একতার আহ্বান।সর্বত্যাগী বুদ্ধদেবের কাছ হতে জেনে নাও দিব্যজ্ঞানে রিপুজয়ের কৌশল এবং অহিংসার নীতি।পরম করুনাময় যীশুখৃষ্টের কাছে আয়ত্ব করো নিজের জীবনকে বলি দিয়ে ক্ষমা আর সত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠার নজির। মহাগুরু নানক আর গুরুগোবিন্দসিংয়ের কাছে নতজানু হয়ে জানো ভগবৎ প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার আদর্শ আর অঙ্গীকারকে।প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের হরিসংকীর্তন, নামযজ্ঞ আর ব্রাহ্মণচন্ডালের ভেদভূলে মানুষকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরার আদর্শকে আয়ত্ব করো।যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে করজোড়ে শিক্ষাগ্রহণ করো পাপের সমুদ্রে ডুবে যাওয়া এবং পৃথিবী হতে কী করে আহরণ করবে অমৃতকে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সমশ্ত হৃদয়হীনতার মাঝে ও কী করে আবিষ্কার করা যায় মানবতা আর ভাববাসাকে? সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় কি করে বলে যাওয়া যায় মহাজীবনের পরম ও চরম সত্যকে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তাঁর জীবনাদর্শ,উপদেশ আর বানীর মাঝে উল্লিখিত সমস্ত মহাপুরুষের বানী আর সাধনার সমন্বয়

ঘটিয়েছেন। চরিত্রগঠন,সুশিক্ষা,সৎজীবিকা,সুসম্পন্ন বিবাহ,সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ইত্যাদির ওপর উনি খুবই জোর দিয়েছেন।

ভোর হতে রাত অবধি সৎসঙ্গ আশ্রমে দেখেছি কর্মের মহামহোৎসব। ভোরে রাগিনী গান।তারপর স্তোত্রপাঠ আর বিনতি। সকালে শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নি:সৃত অমিয়বানী।তারপর ঋত্বিকদের আলোচনা আর কার্য পরিচালনা। ভারত এবং বিদেশের নানাপ্রান্তের যাত্রীদের কত রকমের সমস্যা প্রশ্ন আর তার যথার্থ উত্তর এবং সমাধান। দুপুরে আনন্দবাজার নামক কমন কিচেনে প্রসাদ গ্রহণ।বিকেলে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সান্নিধ্যে।সন্ধ্যায় গেছি রঙ্গনভিলায়। সেখানে যোগ দিয়েছি ছোড়দার (শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র,শ্রী বিবেকরন্জন চক্রবর্ত্তীর) নাটকের মহড়ায়।

ব্যাপারগুলো আমার বেশ ভালো লেগে গেল। একদিন শ্রী যতীনদা, আমাকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ মত তুমি সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্যালয়টা গড়ার কাজে লেগে যাও। তোমার সঙ্গে নরেশদাকে নিয়ে তপোবন বিদ্যালয়ে ছাত্র পড়ানোর কাজে লেগে গেলাম।কিন্তু এ তো যে সে বিদ্যালয়ে নয়। এখানে শিক্ষকের হতে হবে সব চেয়ে বড় ছাত্র। পড়ানোর কায়দাও বেশ আলাদা। এক বিষয় পড়াতে গিয়ে অনেকগুলি বিষয়ের পড়া।

ইংরেজীতে একটা শব্দের বাংলা মানে ,তার সংস্কৃত এবং হিন্দি অর্থ কি? হয়তো সেটা কোনও প্রাণীর নাম।সে প্রাণী কোথায় থাকে, যেখানে থাকে সেই দেশের বিবরণ। সে দেশে যারা বাস করে, তাদের ঘর গৃহস্থালী,রীতি নীতি,আচার আচরণের কথা।সে দেশ আর আমাদের দেশের মিল বা অমিলের গল্প। সেখানকার জল , হাওয়া ,নদ নদী, মেঘবৃষ্টি আর সভ্যতার ইতিহাস । সেদেশের কবি, সাহিত্যিক,বৈজ্ঞানিক আর মহাপুরুষদের কাহিনী।অর্থাৎ বই পত্র থাক, ছাত্রদের সঙ্গে একটা পিরিয়ড ধরে শুধু মুখে মুখে গল্প। এতেই সাহিত্য,বিজ্ঞান,ভূগোল,ইতিহাস আর বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু

আলোচনার সুন্দর পরিবেশ। পড়াটা ছাত্রদের কাছে ট্যাক্সেশন বলে মনে হয় না। টেক্স্টবুক এর কোর্সের সঙ্গে কারীগরী শিক্ষার সুন্দর ব্যাবস্থা। হাতের কাজ,চিত্রকলা,স্হাপত্যে আর ভাস্কর্য্যের মোটামুটি একটা ব্রড আইডিয়া।অর্থাৎ পরিকল্পনা শান্তিনিকেতনের মত শিক্ষায়তন সৃষ্টির । শ্রীশ্রীঠাকুরের পাবনার আশ্রমে এ সবের বিরাট এবং ব্যাপক ব্যাবস্হা ছিলো শুনেছি। তবুও আমরা দেওঘরে মোটামুটি ক্লাশগুলি শুরু করলাম।রামচন্দ্রালয়েই ক্লাশ নেয়া শুরু হলো।আমার আর নরেশদার সঙ্গে চিত্রকর পঞ্চাননদাও যোগ দিলেন।পরে আরো শিক্ষক এলেন। দিনেশদা,হেমদা,কালিদাসদা।খাওয়া দাওয়া গোঁসাইঠাকুর বাড়িতে শোয়ার ব্যাবস্হা রামচন্দ্রালয় অর্থাৎ স্কুলবাড়িতেই। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গের মুখপত্র আলোচনা পত্রিকায় লিখি। সম্পাদক শ্রী প্রবোধদা আর সহকারী সম্পাদক শ্রী পরেশদা (পরেশ ডোড়া)।

আমরা প্রায়ই দেখেছি চীন জাপান,আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হতে দলে দলে টুরিষ্ট আসছে।প্রথম প্রথম দেখেছি তারা বেশ বিজাতীয় ষ্টাইলে কথা বার্তা বলছে।তাদের হাসাহাসি ,চঞ্চল চটুল দৃষ্টি , কথা বার্তা আর চলা ফেরাতে বেশ যেন একটা আলাদা ভাবভঙ্গি।কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের দেখেছি অন্যরূপে।বেশ শান্ত,সংযত,গম্ভীর আর ধীর স্হির প্রকৃতিতে রূপান্তরে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির শিক্ষিত কিছু লোক আর্যভূমি ভারতবর্ষে এসে নতুন কিছু পেয়ে গেল।তারা স্কাইস্ক্রেপারে বাস করতো।কোটিকোটি টাকার তারা অধিকারী।তাদের দেশের মিসাইল, এফ-সিক্সটিন, আণবিক বোমা,সাঁজোয়াবাহিনী,যুদ্ধজাহাজ,পৃথিবীর কাছে বিভীষিকা। এরা চাঁদে যাচ্ছে,গ্রহে গ্রহান্তরে ঘর বাঁধার এক্সপিরিমেন্ট করছে। খেয়াল খুশি মত তারা পৃথিবীর যে কোন একটা দিক মুহুর্ত্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

সেই তাদেরই কেউ কেউ যখন আমাদের কাঁধে হাত রেখে মাটিতে বসে বলছে,এখন বুঝতে পারছি আকাশ আর নক্ষত্রমন্ডলে যাওয়ার আগে নিজের মাথার ভেতরে,বুকের মাঝেও আত্মার মাঝে

একটু তলিয়ে দেখে নেয়া ভালো।নিজের মাথার ভেতরে,বুকের মাঝেও একটা বিশাল জগৎ, মহাসমুদ্র আর জ্যোতির্ময় লোক ঢাকা পড়ে আছে।অনেক অনেক আলো জ্বেলে সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।অবাক হয়ে গেছি।আবার বা কখনো বলেছে , আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ হবো,মানুষকে ভালবাসবো। এ বিশ্বচরাচরের প্রাণীজগৎ,উদ্ভিদজগৎ,সমুদ্রতলের বালুকণা হতে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রলোকে আবার শুভকামনা ,ভালবাসা আর সহানুভূতি পরিব্যাপ্ত হোক। মানুষের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,পীড়িতের সেবা আর দুর্ব্বলকে যেন বলদান করতে পারি।হে ইশ্বর আমার সব আকাঙ্খার নিবৃতি হোক, আমার মনে প্রানে শক্তি দাও। কি আশ্চর্য !কি অদ্ভুত! এই তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কামনার বস্তু। আর কীই বা চাই ? স্পেনসরদা আর হাউসারম্যানদার এ সব কথা ভোলার ন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বলেছেন, সৎসাহিত্য রচনা করো।তোমরাই তো ঈশ্বর।তোমরা স্রষ্টা।তোমাদের সৃষ্টি যেন মানুষের মনে প্রানে হৃদয়ে নতুন পৃথিবীর ছবি এঁকে দেয়।রচনা করে এক অজর,অমর,আনন্দময়, সুন্দর ভূবনের। আর বৈজ্ঞানিকদের বলেছেন তোমরাই তো মানুষের হাতে তুলে দেবে জীবনের সুধা রসে। মৃতসঞ্জীবনী সুধার ফর্মুলা গ্রহে গ্রহে ,নক্ষত্রলোকে ঘর বাঁধার কলাকৌশল জীবনকে অমৃতদান করে ধন্য করার রীতিনীতি তো তোমার নক্ষত্রে।

সাঁওতাল পরগনার উসরপ্রান্তর আজও তেমনি আগের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। গেরুয়া মাটির ঢেউ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ঐ তো ত্রিকুট চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এ পাশে নন্দন পাহাড়। ওদিকে দারোয়া নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে গুমগুম শব্দে ট্রেন ছুটছে। রক্তসন্ধ্যার আলোয় রঙিন আশ্রমে বিনতি হচ্ছে। আর তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারী। আমার বিশ্বাস তাঁদের সকলেরই মনে কোন নতুন ভারতের ছবি উজ্জ্বল ভাস্বর। তাঁরা মানুষকে ভালোবাসেন,মানুষের ভালোর জন্যে মঙ্গলের জন্যে,তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আর

বিতরন করছেন,শুভ শান্তি আর অমৃতের বানী। তাঁদের জয় হোক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

---**শেষ**---